গল্প

# অতসী মামি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

# অতসী মামি (ছোটগল্প)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যে শোনে সেই বলে, হ্যাঁ, শোনবার মতো বটে!

বিশেষ করে আমার মেজমামা। তার মুখে কোনো কিছুর এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা খুব কম শুনেছি।

শুনে শুনে ভারী কৌতুহল হল। কী এমন বাঁশি বাজায় লোকটা যে সবাই এমনভাবে প্রশংসা করে? একদিন শুনতে গেলাম। মামার কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র সঙ্গে নিলাম।

আমি থাকি বালিগঞ্জে, আর যাঁর বাঁশি বাজানোর ওস্তাদির কথা বললাম তিনি থাকেন ভবানীপুর অঞ্চলে। মামার কাছে নাম শুনেছিলাম, যতীন। উপাধিটা শোনা হয়নি। আজ পরিচয়পত্রের উপরে পুরো নাম দেখলাম, যতীন্দ্রনাথ রায়।

বাড়িটা খুঁজে বার করে আমার তো চক্ষুস্থির! মামার কাছে যতীনবাবুর এবং তার বাঁশি বাজানোর যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড়ো আর ভদ্রচেহারা একটা বাড়িতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়িটা যে গলিতে সেটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ যে ইট-বার করা তিনকালের বুড়োর মতো নড়বড়ে একটা ইটের খাঁচা! সামনেটার চেহারাই যদি এ রকম, ভেতরটা না জানি কী রকম হবে।

উইয়ে ধরা দরজাব কড়া নাড়লাম।

একটু পরেই দরজা খুলে যে লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালেন তাকে দেখে মনে হল ছাইগাদা নাড়তেই যেন একটা আগুন বার হয়ে পড়ল।

খুব রোগা। গায়ের রঙও অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবু একদিন চেহারাখানা কী রকম ছিল অনুমান করা শক্ত নয়। এখনও যা আছে, অপুর্ব!

বছর ত্রিশেক বয়স, কী কিছু কম? মলিন হয়ে আসা গায়ের রং অপূর্ব, শরীরের গড়ন অপূর্ব; মুখের চেহারা অপূর্ব। আর সব মিলিয়ে যে রূপ তাও অপূর্ব। সব চেয়ে অপূর্ব চোখ দুটি। চোখে চোখে চাইলে যেন নেশা লেগে যায়।

পুরুষেরও তা হলে সৌন্দর্য থাকে! ইট-বার-করা নোনা-ধরা দেয়াল আর উইয়ে-ধরা দরজা, তার মাঝখানে লোকটিকে দেখে আমার মনে হল ভারী সুন্দর একটা ছবিকে কে যেন অতি বিশ্রী একটা ফ্রেমে বাঁধিয়েছে।

বললেন, আমি ছাড়া তো বাড়িতে কেউ নেই, সুতরাং আমাকেই চান। কিন্তু কী চান?

আমার মুগ্ধ চিত্তে কে যেন একটা ঘা দিল। কী বিশ্রী গলার স্বর! কর্কশ! কথাগুলি মোলায়েম কিন্তু লোকটির গলার স্বর শুনে মনে হল যেন আমায় গালাগালি দিচ্ছেন। ভাবলাম, নির্দোষ সৃষ্টি বিধাতার কুষ্ঠিতে লেখে না। এমন চেহারায় ওই গলা! সৃষ্টিকর্তা যত বড়ো কারিগর হোন, কোথায় কী মানায় সে জ্ঞানটা তার একদম নেই।

বললাম, আপনার নাম তো যতীন্দ্রনাথ রায়? আমি হরেনবাবুর ভাগনে।

পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিলাম।

এক নিশ্বাসে পড়ে বললেন, ইস! আবার পরিচয়পত্র কেন হে? হরেন যদি তোমার মামা, আমিও তোমার মামা। হরেন যে আমায় দাদা বলে ডাকে! এসো, এসো, ভেতরে এসো।

আমি ভেতরে ঢুকতে তিনি দরজা বন্ধ করলেন।

সদর দরজা থেকে দু-ধারের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে হাত পাঁচেক এসে একটা হাত তিনেক চওড়া বারান্দায় পড়ে ডান দিকে বাঁকতে হল। বাঁদিকে বাঁকবার জো নেই, কারণ দেখা গেল সেদিকটা প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা।

ছোট্ট একটু উঠান, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক উঠানের চারটে করে পাশ থাকে, এটারও তাই আছে দেখলাম। দুপাশে দুখানা ঘর, এ বাড়িরই অঙ্গ। একটা দিক প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা, অপর দিকে অন্য এক বাড়ির একটা ঘরের পেছন দিক জানালা দরজার চিহ্নমাত্র নেই, প্রাচীরেরই শামিল।

আমার নবলব্ধ মামা ডাকলেন, অতসী, আমার ভাগনে এসেছে, এ ঘরে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে যাও। ও ঘরটা বড়ো অন্ধকার!

এ-ঘর মানে আমরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ও-ঘর মানে ওদিককার ঘরটা। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী, মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

যতীন মামা বললেন, এ কী! ঘোমটা কেন? আরে, এ যে ভাগনে!

মামির ঘোমটা ঘুচবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বললেন, ছি ছি, মামি হয়ে ভাগনের কাছে ঘোমটা টেনে কলাবউ সাজবে?

এবার মামির ঘোমটা উঠল। দেখলাম, আমার নতুন পাওয়া মামিটি মামারই উপযুক্ত স্ত্রী বটে। মামি এ-ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। ঘরে তক্তপোশ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির বালাই নেই। একপাশে একটা রং-চটা ট্রাঙ্ক আর একটা কাঠের বাকসো। দেয়ালে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত একটা দড়ি টাঙানো, তাতে একটি মাত্র ধুতি ঝুলছে। একটা পেরেকে একটা আধ ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি লটকানো, যতীন মামার সম্পত্তি। গোটা দুই দু-বছর আগেকার ক্যালেন্ডারেব ছবি। একটাতে এখনও চৈত্রমাসের তারিখ লেখা কাগজটা লাগানো রয়েছে, ছিঁড়ে ফেলতে বোধ হয় কারও খেয়াল হয়নি।

যতীন মামা বললেন, একটু সুজিটুজি থাকে তো ভাগনেকে করে দাও। না থাকে এক কাপ চাই খাবেখন।

বললাম, কিছু দরকার নেই যতীন মামা। আপনার বাঁশি শুনতে এসেছি, বাঁশির সুরেই খিদে মিটবে এখন। যদিও খিদে পায়নি মোটেই, বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

যতীন মামা বললেন, বাঁশি? বাঁশি তো এখন আমি বাজাই না।

বললাম, সে হবে না, আপনাকে শোনাতেই হবে।

বললেন, তা হলে বসো, রাত্রি হোক। সন্ধ্যার পর ছাড়া আমি বাঁশি ছুই না।

বললাম, কেন?

যতীন মামা মাথা নেড়ে বললেন, কেন জানি না ভাগনে, দিনের বেলা বঁশি বাজাতে পারি না। আজ পর্যন্ত কোনোদিন বাজাইনি। হ্যাঁ গা অতসী, বাজিয়েছি?

অতসী মামি মৃদু হেসে বললেন, না।

যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এমনিভাবে যতীন মামা বললেন, তবে?

বললাম, মোটে পাঁচটা বেজেছে, সন্ধ্যা হবে সাতটায়। এতক্ষণ বসে থেকে কেন আপনাদের অসুবিধা করব, ঘুরে-টুরে সন্ধ্যার পর আসব এখন।

যতীন মামা ইংরেজিতে বললেন, □□□! □□□! তারপর বাংলায় যোগ দিলেন, কী যে বল ভাগনে! অসুবিধেটা কী হে অ্যাঁ! পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে অপবাদ দিয়ে, তুমি থাকলে তবু কথা কয়ে বাঁচব।

আমি বললাম, পাড়ার লোকে কী অপবাদ দিয়েছে মামা? অতসী মামির দিকে চেয়ে যতীন মামা হাসলেন, বলব নাকি ভাগনেকে কথাটা অতসী? পাড়ার লোকে কী বলে

জানো ভাগনে? বলে অতসী আমার বিয়ে করা বউ নয়!—চোখের পলকে হাসি মুছে রাগে যতীন মামা গরগর করতে লাগলেন, লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত লোক পাড়ার, ভাগনে। রীতিমতো দলিল আছে বিয়ের, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? যত স—

ত্রস্তভাবে অতসী মামি বললে, কী যা-তা বলছ?

যতীন মামা বললেন, ঠিক ঠিক, ভাগনে নতুন লোক, তাকে এ সব বলা ঠিক হচ্ছে না বটে। ভারী রাগ হয় কিনা! বলে হাসলেন। হঠাৎ বললেন, তোমরা যে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলছ না গো!

মামি মৃদু হেসে বললে, কী কথা বলব?

যতীন মামা বললেন, এই নাও! কী কথা বলবে তাও কি আমায় বলে, দিতে হবে নাকি? যা হোক কিছু বলে শুরু কর, গড়গড় করে কথা আপনি এসে যাবে।

মামি বললে, তোমার নামটি কী ভাগনে?

যতীন মামা সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, এইবার ভাগনে, পালটা প্রশ্ন কর, আজ কী রাঁধবে মামি? ব্যস, খাসা আলাপ জমে যাবে। তোমার আরম্ভটি কিন্তু বেশ অতসী।

মামির মখ লাল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আমন বিশ্রী প্রশ্ন আমি কক্‌খনো করব না মামি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার নাম সুরেশ।

সতীন মামা বললেন, সুরেশ কিনা সুরের রাজা, তাই সুর শুনতে এত আগ্রহ। নয় ভাগনে?

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইস! ভুবনবাবু যে টাকা দুটো ফেরত দেবে বলেছিল আজ! নিয়ে আসি, দুদিন বাজার হযনি। বসো ভাগনে, মামির সঙ্গে গল্প করো, দশ মিনিটের ভেতর আসছি।

ঘরের বাইবে গিয়ে বললেন, দোরটা দিয়ে যাও অতসী। ভাগনে ছেলেমানুষ, কেউ তোমার লোভে ঘরে ঢুকলে ঠেকাতে পারবে না।

মামিব মুখ আরক্ত হয়ে উঠল এবং সেটা গোপন করতে চট করে উঠে গেল। বাইরে তার চাপা গলা শুনলাম, কী যে রসিকতা কর, ছি! মামা কী জবাব দিলে- শোনা গেল না।

মামি ঘরে ঢুকে বললে, ওই রকম স্বভাব ওঁর। বাক্সে দুটি মোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজার গেলেন। বললাম, একটা থাক। জবাব দিলেন, কেন? রাস্তায় ভুবনবাবু চাইতে টাকা দুটি তাকে দিয়ে খালি হাতে ঘরে ঢুকলেন।

আমি বললাম, আশ্চর্য লোক তো! মামি বললে, ওই রকমই। আর দাখো ভাই–

বললাম, ভাই নয়, ভাগনে।

মামি বললে, তাও তো বটে। আগে থাকতেই যে সম্বন্ধটা পাতিয়ে যে বসে আছ! ওঁর ভাগনে না হয়ে আমার ভাই হলেই বেশ হত কিন্তু। সম্পর্কটা নতুন করে পাতো না? এখনও এক ঘণ্টাও হযনি, জমাট বাঁধেনি।

আমি বললাম, কেন? মামি-ভাগনে বেশ তো সম্পর্ক!

মামি বললে, আচ্ছা তবে তাই। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে ভাগনে। তুমি ওঁর বাঁশি শুনতে চেয়ো না।

বললাম, তার মানে? বাঁশি শুনতেই তো এলাম!

মামির মুখ গম্ভীর হল, বললে, কেন এলে? আমি ডেকেছিলাম? তোমাদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেব?

আমি অবাক হয়ে মামির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কথা জোগায় না।

মামি বললে, তোমাদের একটু শখ মেটাবার জন্য উনি আত্মহত্যা করছেন দেখতে পাও না? রোজ তোমরা একজন না একজন এসে বাঁশি শুনতে চাইবে। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়লে মানুষ কদিন বাঁচে!

রক্ত! রক্ত নয়? দেখবে? বলে মামি চলে গেল। ফিরে এল একটা গামলা হাতে করে। গামলার ভেতরে জমাট-বাধা খানিকটা রক্ত।

মামি বললে, কাল উঠেছিল, ফেলতে মায়া হচ্ছিল তাই রেখে দিয়েছি। রেখে কোনো লাভ নেই জানি, তবু–

আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম, জানতাম না মামি। জানলে ককখনো শুনতে চাইতাম না। ইস, এই জন্যেই মামার শরীর এত খারাপ?

মামি বললে, কিছু মনে করো না ভাগনে। অন্য কারও সঙ্গে তো কথা কই না, তাই তোমাকেই গায়ের ঝাল মিটিয়ে বলে নিলাম। তোমার আর কী দোষ, আমার অদৃষ্ট!

আমি বললাম, এত রক্ত পড়ে, তবু মামা বাঁশি বাজান?

মামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ, পৃথিবীর কোনো বাধাই ওঁর বাঁশি বাজানো বন্ধ করতে পারবে না। কত বলেছি, কত কেঁদেছি শোনেন না।

আমি চুপ করে রইলাম।

মামি বলে চলল, কতদিন ভেবেছি বাঁশি ভেঙে ফেলি, কিন্তু সাহস হয়নি। বাঁশির বদলে মদ খেয়েই নিজেকে শেষ করে ফেলবেন, নয়তো যেখানে যা আছে সব বিক্রি করে বাঁশি কিনে না খেয়ে মরবেন।

মামির শেষ কথাগুলি যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কথা বলতে গেলাম, কিন্তু ফুটল না।

মামি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, অথচ ওই একটা ছাড়া আমার কোনো কথাই ফেলেন না। আগে আকণ্ঠ মদ খেতেন, বিয়ের পর যেদিন মিনতি করে মদ ছাড়তে বললাম সেইদিন থেকে ও জিনিস ছোঁয়াই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাঁশির বিষয়ে কোনো কথাই শোনেন না।

আমি বলতে গেলাম, মামি–

মামি বোধ হয় শুনতেই পেল না, বলে চলল, একবার বাঁশি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সে কী ছটফট করতে লাগলেন যেন ওঁর সর্বস্ব হারিয়ে গেছে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। মামি দরজা খুলতে উঠে গেল।

যতীন মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, দিলে না টাকা অতসী, বললে পরশু যেতে।

পিছন থেকে মামি বললে, সে আমি আগেই জানি।

যতীন মামা বললেন, দোকানদারটাই বা কী পাজি, একপো সুজি চাইলাম, দিল না। মামার বাড়ি এসে ভাগনেকে দেখছি খালি পেটে ফিরতে হবে।

মামি ম্লান মুখে বললে, সুজি দেয়নি ভালোই করেছে। শুধু জল দিয়ে তো আর সুজি হয় না।

ঘি নেই?

কবে আবার ঘি আনলে তুমি?

তাও তো বটে! বলে যতীন মামা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। দিব্য সপ্রতিভ হাসি।

আমি বললাম, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মামা, খাবারের কিছু দরকার নেই। ভাগনের সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে নেই।

মামি বললে, বসো তোমরা, আমি আসছি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মামা হেঁকে বললেন, কোথায় গো? বারান্দা থেকে জবাব এল, আসছি।

মিনিট পনেরো পরে মামি ফিরল। দু হাতে দুখানা রেকাবিতে গোটা চারেক করে রসগোল্লা, আর গোটা দুই সন্দেশ।

যতীন মামা বললেন, কোথেকে জোগাড় করলে গো? বলে, একটা রেকাবি টেনে নিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে তুললেন।

অন্য রেকাবিটা আমার সামনে রাখতে রাখতে মামি বললে, তা দিয়ে তোমাব দরকার কী?

যতীন মামা নিশ্চিন্তভাবে বললেন, কিছু না! যা খিদেটা পেয়েছে; ডাকাতি করেও যদি এনে থাক কিছু দোষ হয়নি। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সাধ্বী অনেক কিছুই করে।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতে গেলাম, কেন মিথ্যে–

বাধা দিয়ে মামি বললে, আবার যদি ওই সব শুরু কর ভাগনে, আমি কেঁদে ফেলব।

আমি নিঃশব্দে খেতে আরম্ভ কবলাম।

মামি ও ঘর থেকে দুটো এনামেলের গ্রাসে জল এনে দিলেন। প্রথম রসগোল্লাটা গিলেই মামা বললেন, ওযাক্! কী বিশ্রী বসগোল্লা! রইল পড়ে, খেয়ো তুমি, নয় তো ফেলে দিযো। দেখি সন্দেশটা কেমন!

সন্দেশ মুখে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ এ জিনিসটা ভালো, এটা খাব। বলে সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বললেন, যাও তোমার সুজির ঢিপি ফেলে দিয়োখন নর্দমায়।

অতসী মামির চোখ ছলছল করে এল। মামার ছলটুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইল না। কেন যে এমন খাসা রসগোল্লাও মামার কাছে সুজির টিপি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হল।

মাথা নিচু করে রেকাবিটা শেষ করলাম। মাঝখানে একবার চোখ তুলতেই নজরে পড়ল মামি মামার রেকাবিটা দরজার ওপরে তাকে তুলে রাখছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মামি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাল, ধুনো দিল। আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে মামি চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

যতীন মামা হেসে বললেন, আরে লজ্জা কীসের! নিত্যকার অভ্যাস, বাদ পড়লে রাতে ঘুম হবে না। ভাগনের কাছে লজ্জা করতে নেই।

আমি বললাম, আমি, না হয়–

মামি বললে, বসো, উঠতে হবে না, অত লজ্জা নেই আমার। বলে, গলায় আঁচল দিয়ে মামার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

লজ্জায় সুখে তৃপ্তিতে আরক্ত মুখখানি নিয়ে অতসী মামি যখন উঠে দাঁড়াল, আমি বললাম, দাঁড়াও মামি, একটা প্রণাম করে নিই।

মামি বললে, না না ছি ছি–

বললাম, ছিছি নয় মামি। আমার নিত্যকার অভ্যাস না হতে পারে, কিন্তু তোমায় প্রণাম না করে যদি আজ বাড়ি ফিরি রাত্রে আমার ঘুম হবে না ঠিক। বলে মামির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

যতীন মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

মামি বললে, দ্যাখো তো ভাগনের কাণ্ড!

যতীন মামা বললেন, ভক্তি হয়েছে গো! সকালসন্ধা স্বামীকে প্রণাম করো জেনে শ্রদ্ধা হয়েছে ভাগনের।

কী যে বল!–বলে মামি পলায়ন করল। বারান্দা থেকে বলে গেল, আমি রান্না করতে গেলাম।

যতীন মামা বললেন, এইবার বাঁশি শোনো।

আমি বললাম, থাকগে, কাজ নেই মামা। শেষে আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে।

যতীন মামা বললেন, তুমিও শেষে ঘ্যানঘান পানপ্যান আরম্ভ করলে ভাগনে? রক্ত পড়বে তো হয়েছে কী? তুমি শুনলেও আমি বাজাব, না শুনলেও বাজাব। খুশি হয় রান্নাঘরে মামির কাছে বসে কানে আঙুল দিয়ে থাকো গে।

কাঠের বাক্সোটা খুলে বাঁশির কাঠের কেসটা বার করলেন। বললেন, বারান্দায় চলো, ঘরে বড়ো শব্দ হয়।

নিজেই বারান্দায় মাদুরটা তুলে এনে বিছিয়ে নিলেন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশিটা মুখে তুললেন।

হঠাৎ আমার মনে হল আমার ভেতরে যেন একটা উন্মাদ একটা খ্যাপা উদাসীন ঘুমিয়ে ছিল আজ বাঁশির সুরের নাড়া জেগে উঠল। বাঁশির সুর এসে লাগে কানে কিন্তু আমার মনে হল বুকের তলেও যেন সাড়া পৌঁছেছে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আত্মপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌঁছায়নি, বাইরের এই ঘরদেরকেও যেন স্পর্শ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে মৃদুভাবে স্পর্শ করতে করতে যেন দূরে, বহুদূরে, যেখানে গোটা কয়েক তারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে স্বপ্নের মায়ার মধ্যে লয় পাচ্ছে। অন্তরে ব্যথা বোধ করে আনন্দ পাবার যতগুলি অনুভূতি আছে বাঁশির সুর যেন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি আরম্ভ করেছে।

বাঁশি শুনেছি ঢের। বিশ্বাস হয়নি এই বাঁশি বাজিয়ে একজন একদিন এক কিশোরীর কুল মান লজ্জা ভয় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, যমুনাতে উজান বইয়েছিল। আজ মনে হল, আমার যতীন মামার বাঁশিতে সমগ্র প্রাণ যদি আচমকা জেগে উঠে নিরর্থক এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে সেই বিশ্ববাঁশির বাদকের পক্ষে ওই দুটি কাজ আর এমন কী কঠিন!

দেখি, মামি কখন এসে নিঃশব্দে ওদিকের বারান্দায় বসে পড়েছে। খুব সম্ভব ওই ঘরটাই রান্নাঘর, কিংবা রান্নাঘরে যাবার পথ ওই ঘরের ভেতব দিয়ে।

যতীন মামার দিকে চেয়ে দেখলাম, খুব সম্ভব সংজ্ঞা নেই। এ যেন সুরের আত্মভোলা সাধক, সমাধি পেয়ে গেছে।

কতক্ষণ বাঁশি চলেছিল ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। হঠাৎ এক সময়ে বাঁশি থামিয়ে যতীন মামা ভয়ানক কাশতে আরম্ভ করলেন। বারান্দার ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে পারলাম, মামার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে উঠেছে।

অতসী মামি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, জল আর পাখা নিয়ে ছুটে এল। খানিকটা রক্ত তুলে মামির শুশ্রূষায় যতীন মামা অনেকটা সুস্থ হলেন। মাদুরের ওপর একটা বালিশ পেতে মামি তাকে শুইয়ে দিল। পাখা নেড়ে নীরবে হাওয়া করতে লাগল।

তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আজ আসি যতীন মামা।

মামা কিছু বলবার আগেই মামি বললে, তুমি এখন কথা কয়ো না। ভাগনের বাড়িতে ভাববে, আজ থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবে এখন। চলো আমি দরজা দিয়ে আসছি।

সদরের দরজা খুলে বাইরে যাব, মামি আমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, একটু দাঁড়াও ভাগনে, সামলে নিই।

প্রদীপের আলোতে দেখলাম, মমির সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপিছে। একটু সুস্থ হয়ে বললে, ওর রক্ত পড়া দেখলেই আমার এরকম হয়। বাঁশি শুনেও হতে পারে। আচ্ছা এবার এসো ভাগনে, শিগগির আর একদিন আসবে কিন্তু।

বললাম, মামার বাঁশি ছাড়াতে পারি কি না একবার চেষ্টা করে দেখব মামি?

মামি বাগ্রকণ্ঠে বললে, পারবে? পারবে তুমি? যদি পার ভাগনে, শুধু তোমার যতীন মামাকে নয়, আমাকেও প্রাণ দেবে।

অতসী মামি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

রাস্তায় নেমে বললাম, খিলটা লাগিয়ে দাও মামি।

কেবলই মনে হয়, নেশাকে মানুষ এত বড়ো দাম দেয় কেন। লাভ কী? এই যে যতীন মামা পলে পলে জীবন উৎসর্গ করে সুরের জাল বুনবার নেশায় মেতে যান, মানি তাতে আনন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তারও, যে শোনে তারও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিযে কী সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি, এ তো ক্ষণিকের। যতক্ষণ সৃষ্টি করা যায় শুধু

ততক্ষণ এ স্থিতি। তারপর বাস্তবের কঠোরতার মাঝে এ স্বপ্নের চিহ্নও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ নিরর্থক মায়া সৃষ্টি করে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কী বিচিত্র। আমারও ইচ্ছে করে যতীন মামার মতো সুরের আলোয় ভুবন ছেয়ে ফেলে, সুরের আগুন গগনে বেয়ে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! লাভ নেই? নাই বা রইল।

এতদিন জানতাম, আমিও বাঁশি বাজাতে জানি। বন্ধুরা শুনে প্রশংসাও করে এসেছে। বাঁশি বাজিয়ে আনন্দও যে না পাই তা নয়। কিন্তু যতীন মামার বাঁশি শুনে এসে মনে হল, বাঁশি বাজানো আমার জন্যে নয়। এক একটা কাজ করতে এক একজন লোক জন্মায়, আমি বাঁশি বাজাতে জন্মাইনি। যতীন মামা ছাড়া বাঁশি বাজাবার অধিকার কারও নেই।

থাকতে পারে কারও অধিকার। কারও কারও বাঁশি হয়তো যতীন মামার বাঁশির চেয়েও মনকে উতলা করে তোলে, আমি তাদের চিনি না।

একদিন বললাম, বাঁশি শিখিয়ে দেবে মামা?

যতীন মামা হেসে বললে, বাঁশি কি শেখাবার জিনিস ভাগনে? ও শিখতে হয়।

তা ঠিক। আর শিখতেও হয় মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিযে। নইলে আমার বাঁশি শেখার মতোই সে শিক্ষা বার্থ হয়ে যায়।

অতসী মামিকে সেদিন বিদায় নেবার সময় যে কথা বলেছিলাম সে কথা ভুলিনি। কিন্তু কী করে যে যতীন মামার বাঁশি ছাড়াব ভেবে পেলাম না। অথচ দিনের পর দিন যতীন মামা যে এই সর্বনাশা নেশায় পলে পলে মরণের দিকে এগিয়ে যাবেন। কথা ভাবতেও কষ্ট হল। কিন্তু করা যায় কী? মামির প্রতি যতীন মামার যে ভালোবাসা তার বোধ হয় তল নেই, মামির কান্নাই যখন ঠেলেছেন তখন আমার সাধ্য কী তাকে ঠেকিয়ে রাখি!

একদিন বললাম, মামা, আর বাঁশি বাজাবেন না।

যতীন মামা চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, বাঁশি বাজাব না? বল কী ভাগনে? তাহলে বাঁচব কী করে?

বললাম, গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, মামি কত কাঁদে।

তা আমি কি করব? একটু-আধটু কাঁদা ভালো। বলে হাকলেন, অতসী! অতসী!

মামি এল।

মামা বললেন, কান্না কী জন্যে শুনি? বাঁশি ছেড়ে দিয়ে আমায় মরতে বল নাকি? তাতে কান্না বাড়বে, কমবে না।

মামি ম্লানমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মামা বললেন, জানো ভাগনে, এই অতসীর জ্বালায় আমার বেঁচে থাকা ভার হয়ে উঠেছে। কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, নড়বার নাম নেই। ওর ভার ঘাড়ে না থাকলে বাঁশি বগলে মনের আনন্দে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়ানো-টেড়ানো সব মাথায় উঠেছে।

মামি বললে, যাও না বেড়াতে, আমি ধরে রেখেছি?

রাখোনি? বলে মামা এমনিভাবে চাইলেন যেন নিজের চোখে তিনি অতসী মামিকে খুন করতে দেখেছেন আর মামি এখন তাঁর সমুখেই সে কথা অস্বীকার করছে।

মামির চোখে জল এল। অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বললে, অমন কর তো আমি একদিন–

মামা একেবারে জল হয়ে গেলেন। আমার সামনেই মামির হাত ধরে কোঁচার কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ঠাট্টা করছিলাম, সত্যি বলছি অতসী,-

চট করে হাত ছাড়িয়ে মামি চলে গেল!

আমি বললাম, কেন মিথ্যে চটালেন মামিকে?

যতীন মামা বললেন, চটেনি। লজ্জায় পালাল।

কিন্তু একদিন যতীন মামাকে বাঁশি ছাড়তে হল। মামিই ছাড়াল।

মামির একদিন হঠাৎ টাইফয়েড জ্বর হল।

সেদিন বুঝি জ্বরের সতেরো দিন। সকাল নটা বাজে। মামি ঘুমুচ্ছে, আমি তার মাথায আইসব্যাগটা চেপে ধরে আছি। যতীন মামা একটু টুলে বসে স্নানমুখে চেয়ে আছেন। রাত্রি জেগে তার শরীর আরও শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চুল উশকোখুশকো।

হঠাৎ টুল ছেড়ে উঠে মামা ট্রাঙ্কটা খুলে বাঁশিটা বার কবলেন। আজ সতেরো দিন এটা বাক্সেই বন্ধ ছিল।

সবিস্ময়ে বললাম, বাঁশি কী হবে মামা?

ছেঁড়া পাম্পশুতে পা ঢুকোতে ঢুকোতে মামা বললেন, বেচে দিয়ে আসব।

তার মানে? যতীন মামা স্নান হাসি হেসে বললেন, তার মানে ডাক্তার বোসকে আর একটা কল দিতে হবে।

বললাম, বাঁশি থাক, আমার কাছে টাকা আছে।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হেসে যতীন মামা পেরেকে টাঙানো জামাটা টেনে নিলেন।

যদি দরকার পড়ে ভেবে পকেটে কিছু টাকা এনেছিলাম। মিথ্যা চেষ্টা। আমার মেজো মামা কতবার কত বিপদে যতীন মামাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন, যতীন মামা একটি পয়সা নেননি। বললাম, কোথাও যেতে হবে না মামা, আমি কিনব বাঁশি।

মামা ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, তুমি কিনবে ভাগনে? বেশ তো! বললাম, কত দাম? বললেন, একশো পঁয়ত্রিশে কিনেছি, একশো টাকায় দেব। বাঁশি ঠিক আছে, কেবল সেকেন্ড হ্যাণ্ড এই যা।

বললাম, আপনি না সেদিন বলছিলেন মামা, এ রকম বঁশি খুঁজে পাওয়া দায়, অনেক বেছে আপনি কিনেছেন? আমি একশো পঁয়ত্রিশ দিয়েই ওটা কিনব।

যতীন মামা বললেন, তা কি হয়। পুরনো জিনিস–

বললাম, আমাকে কি জোচ্চোর পেলেন মামা? আপনাকে ঠকিয়ে কম দামে বাঁশি কিনব?

পকেটে দশ টাকার তিনটে নোট ছিল, বার করে মামার হাতে দিয়ে বললাম, ত্রিশ টাকা আগাম নিন, বাকি টাকাটা বিকেলে নিয়ে আসব।

যতীন মামা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে নোটগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা!

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যতীন মামার মুখের ভাবটা দেখবার সাধ্য হল না।

যতীন মামা ডাকলেন, ভাগনে–

ফিরে তাকালাম।

যতীন মামা হাসবার চেষ্টা করে বললেন, খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে ভেব না, বুঝলে ভাগনে?

আমার চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে মামির শিয়রে গিয়ে বসলাম।

মামির ঘুম ভাঙেনি, জানতেও পারল না যে রক্তপিপাসু বাঁশিটা ঝলকে ঝলকে মামার রক্ত পান করেছে, আমি আজ সেই বাঁশিটা কিনে নিলাম।

মনে মনে বললাম, মিথ্যে আশা। এ যে বালির বাঁধ! একটা বাঁশি গেল, আর একটা কিনতে কতক্ষণ? লাভের মধ্যে যতীন মামা একান্ত প্রিয়বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার বেদনাটাই পেলেন।

বিকালে বাকি টাকা এনে দিতেই যতীন মামা বললেন, বাড়ি যাবার সময় বাঁশিটা নিয়ে যেও। আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, থাক না এখন কদিন, এত তাড়াতাড়ি কীসের?

যতীন মামা বললেন, না। পরের জিনিস আমি বাড়িতে রাখি না। বুঝলাম, পরের হাতে চলে যাওয়া বাঁশিটা চোখের ওপরে থাকা তাঁর সহ্য হবে না।

বললাম, বেশ মামা, তাই নিয়ে যাবখন।

মামা ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, নিয়েই যেও | তোমাব জিনিস এখানে কেন ফেলে রাখবে। বুঝলে না?

উনিশ দিনেব দিন মামির অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল।

যতীন মামা টুলটা বিছানার কাছে টেনে টেনে মামির একটা হাত মুঠো করে ধরে নীরবে তার রোগশীর্ণ ঝরা ফুলের মতো ম্লান মুখের দিকে চেয়েছিলেন, হঠাৎ অতসী মামি বললে, ওগো আমি বোধ হয় আর বাঁচিব না।

যতীন মামা বললেন, তা কি হয় অতসী, তোমায় বাঁচতে হবেই। তুমি না বাঁচলে আমিও যে বাঁচব না?

মামি বললে, বালাই, বাঁচবে বইকী। দ্যাখো, আমি যদি নাই বাঁচি, আমার একটা কথা রাখবে? যতীন মামা নত হয়ে বললেন, রাখব। বলো।

বঁশি বাজানো ছেড়ে দিয়ো। তিলতিল করে তোমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে দেখে ওপারে গিয়েও আমার শান্তি থাকবে না। রাখবে আমার কথা?

মামা বললেন, তাই হবে অতসী। তুমি ভালো হয়ে ওঠো। আমি আর বঁশি ছোঁব না।

মামির শীর্ণ ঠোঁটে সুখের হাসি ফুটে উঠল। মামার একটা হাত বুকের ওপর টেনে শ্রান্তভাবে মামি চোখ বুজল।

আমি বুঝলাম যতীন মামা আজ তাঁর রোগশয্যাগতা অতসীর জন্য কত বড়ো একটা ত্যাগ করলেন। অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত ওই কটি কথা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমি আর বঁশি ছোব না, অন্যে না বুঝুক আমি তো যতীন মামাকে চিনি, আমি জানি, অতসী মামিও জানে ওই কথা কটির পেছনে কতখানি জোর আছে! বাঁশি বাজাবার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠলেও যতীন মামা আর বাঁশি ছোঁবেন না।

শেষ পর্যন্ত মামি ভালো হয়ে উঠল। যতীন মামার মুখে হাসি ফুটল। মামি যেদিন পথ্য পেল সেদিন হেসে মামা বললেন, কী গো, বাঁচবে না বলে? অমনি মুখের কথা কি না! যে চাঁড়াল খুড়োর কাছ থেকেই তোমায় ছিনিয়ে এনেছি, যম ব্যাটা তো ভালোমানুষ।

আমি বললাম, চাঁড়াল খুড়ো আবার কী মামা?

মামা বললেন, তুমি জান না বুঝি? সে এক দ্বিতীয় মহাভারত।

মামি বললে, গুরুনিন্দা কোরো না।

মামা বললেন, গুরুনিন্দা কী? গুরুতর নিন্দা করব। ভাগনেকে দেখাও না। অতসী তোমার পিঠের দাগটা।

মামির বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মামা ইতিহাসটা শুনিয়ে দিলেন। নিজের খুড়ো নয়, বাপের পিসতুতো ভাই। মা বাবাকে হারিয়ে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ওই খুড়োর কাছেই অতসী

মামি ছিল। অত বড়ো মেয়ে, তাকে কিলচড় লাগাতে খুড়োটির বাধত না, আনুষঙ্গিক অন্য সব তো ছিলই। খুড়োর মেজাজের একটি অক্ষয় চিহ্ন আজ পর্যন্ত মামির পিঠে আছে। পাশের বাড়িতেই যতীন মামা বাঁশি বাজাতেন আর আকণ্ঠ মদ খেতেন। প্রায়ই খুড়োর গর্জন আর অনেক রাতে মামির চাপা কান্নার শব্দে তার নেশা ছুটে যেত। নিতান্ত চটে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন করলেন এবং বিয়ে করে ফেললেন।

মামার ইতিহাস বলা শেষ হলে অতসী মামি ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, তখন কি জানি মদ খায়! তাহলে কক্‌খনো আসতাম না।

মামা বললেন, তখন কী জানি তুমি মাথার রতন হয়ে আঠার মতো লেপটে থাকবে! তাহলে কক্‌খনো উদ্ধার করতাম না। আর মদ না খেলে কি এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করার মতো বিশ্রী কাজটা করতে পারতাম গো! আমি ভেবেছিলাম, বছরখানেক–

মামি বললে, যাও, চুপ করো। ভাগনের সামনে যা তা বকো না।

মামা হেসে চুপ করলেন।

মাস দুই পরের কথা।

কলেজ থেকে সটান যতীন মামার ওখানে হাজির হলাম। দেখি, জিনিসপত্র যা ছিল বাঁধাছাঁদা হয়ে পড়ে আছে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, এ সব কী মামা?

যতীন মামা সংক্ষেপে বললেন, দেশে যাচ্ছি।

দেশে? দেশ আবার আপনার কোথায়?

যতীন মামা বললেন, আমার কী একটা দেশও নেই ভাগনে? পাঁচশো টাকা আয়ের জমিদারি আছে দেশে, খবর রাখ?

অতসী মামি বললে, হয়তো জন্মের মতোই তোমাদের ছেড়ে চললাম ভাগনে। আমার অসুখের জন্যই এটা হল।

বললাম, তোমার অসুখের জন্য? তার মানে?

মামা বললেন, তার মানে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। যিনি কিনেছেন পাশের বাড়িতেই থাকেন, মাঝখানের প্রাচীরটা ভেঙে দুটো বাড়ি এক করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, এত কাণ্ড করলে মামা, আমাকে একবার জানালে না পর্যন্ত! করে যাওয়া ঠিক হল?

বাঁধা বিছানা আর তালাবন্ধ বাক্সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামা বললেন, আজ। রাত্রে ঢাকা মেলে রওনা হব। আমরা বাঙাল হে ভাগনে, জানো না বুঝি? বলে মামা হাসলেন। অবাক মানুষ! এমন অবস্থায় হাসিও আসে!

গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা, আসি যতীন মামা, আসি মামি। বলে দরজার দিকে

অগ্রসর হলাম।

অতসী মামি উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধবে বললে, লক্ষ্মী ভাগনে, রাগ কোরো না। আগে থাকতে তোমায় খবর দিয়ে লাভ তো কিছু ছিল না, কেবল মনে ব্যথা পেতে। যে ভাগনে তুমি, কত কী হাঙ্গামা বাঁধিয়ে তুলতে ঠিক আছে কিছু?

আমি ফিরে গিয়ে বাঁধা বিছানাটার ওপর বসে বললাম, আজ যদি না আসতাম, একটা খবরও তো পেতাম না। কাল এসে দেখতাম, বাড়িঘর খাঁখাঁ করছে।

যতীন মামা বললেন, আরে রামঃ! তোমায় না বলে কি যেতে পারি? দুপুরবেলা সেনের ডাক্তারখানা থেকে ফোন করে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলেই খবর পেতে|

বাড়ি আর গেলাম না। শিয়ালদহ স্টেশনে মামা-মামিকে উঠিয়ে দিতে গেলাম। গাড়ি ছাড়ার আগে কতক্ষণ সময় যে কী করেই কাটল! কারও মুখেই কথা নেই। যতীন মামা কেবল মাঝে মাঝে দু একটা হাসির কথা বলছিলেন এবং হাসাচ্ছিলেনও। কিন্তু তার বুকের ভেতর যে কী করছিল সে খবর আমার অজ্ঞাত থাকেনি।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজলে যতীন মামা আর অতসী মামিকে প্রণাম করে গাড়ি থেকে নামলাম। এইবার যতীন মামা অন্যদিকে মুখ ফঋয়ে নিলেন। আর বোধ হয় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হল মা!

জানাল দিয়ে মুখ বার করে মামি ডাকলে, শোনো। কাছে গেলাম। মামি বললে, তোমাকে ভাগনে বলি আর যাই বলি, মনে মনে জানি তুমি আমার ছোটো ভাই। পার তো একবার বেড়াতে গিয়ে দেখা দিয়ে এসো। আমাদের হয়তো আর কলকাতা আসা হবে না, জমির ভা্রী ক্ষতি হয়ে গেছে। যেও, কেমন ভাগনে?

মামির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালাম, যাব।

বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দূরের লাল সবুজ আলোকবিন্দুর ওপারে যখন একটি চলন্ত লাল বিন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ফিরলাম। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে গেছে।

মানুষের স্বভাবই এই যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সকলের বড়ো করে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল, যে যতীন মামা আর অতসী মামির বিচ্ছেদে একুশ বছর

বয়সে আমার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল সেই যতীন মামা আর অতসী মামি একদিন আমার মনের এক কোণে সংসারের সহস্র আবর্জনার তলে চাপা পড়ে যাবেন।

জীবনে অনেকগুলি ওলট-পালট হয়ে গেল। যথাসময়ে ভাগ্য আমার ঘাড় ধরে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। নানা কারণে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। বালিগঞ্জের বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে ঋণ শোধ দিয়ে আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি নিয়ে শ্যামবাজার অঞ্চলে ছোটো একটা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলাম। মার কাঁদাকাটায় গলে একটা বিয়েও করে ফেললাম।

প্রথম সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তেতো লাগতে লাগল, জীবনটা বিস্বাদ হয়ে গেল, আশা-আনন্দের এতটুকু আলোড়নও ভেতরে খুঁজে পেলাম না।

তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেল। নতুন জীবনে রসের খোঁজ পেলাম। জীবনের জুয়াখেলায় হারজিতের কথা কদিন আর মানুষ বুকে পুষে রাখতে পারে?

জীবনে যখন এই সব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে তখন নিজেকে নিয়ে আমি এমনি ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম যে কবে এক যতীন মামা আর অতসী মামির স্নেহ পরমসম্পদ বলে গ্রহণ করেছিলাম সে কথা মনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। সাত বছর পরে আজ ক্কচিৎ কখনও হয়তো একটা অস্পষ্ট স্মৃতির মতো তাদের কথা মনে পড়ে।

মাঝে একবার মনে পড়েছিল, যতীন মামাদের দেশে চলে যাওয়ার বছর তিনেক পরে। সেইবার ঢাকা মেলে কলিশন হয়। মৃতদের নামের মাঝে যতীন্দ্রনাথ রায় নামটা দেখে যে খুব একটা ঘা লেগেছিল সে কথা আজও মনে আছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু হয়নি। সেদিন আপিস থেকে ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর কঠিন অসুখ। মনে পড়ে যতীন মামার দেশের ঠিকানায় একটা পত্র লিখে দিয়ে এই ভেবে মনকে সান্তনা দিয়েছিলাম, ও নিশ্চয় আমার যতীন মামা নয়। পৃথিবীতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অভাব তো নেই। সে চিঠির কোনো জবাব আসেনি। স্ত্রীর অসুখের হিড়িকে কথাটাও আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আরও চারটে বছর কেটে গেছে।

আমার ছোটো বোন বীণার বিয়ে হয়েছিল ঢাকায়।

পুজোর সময় বীণাকে তারা পাঠালে না। অগ্রহায়ণ মাসে বীণাকে আনতে ঢাকা গেলাম। কিন্তু আনা হল না। গিয়েই দেখি বীণার শাশুড়ির খুব অসুখ। আমি যাবার আগের দিন হু হু করে জ্বর এসেছে। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন নিউমোনিয়া।

ছুটি ছিল না, ক্ষুন্ন হয়ে একাই ফিরলাম। গোয়ালন্দে স্টিমার থেকে নেমে ট্রেনের একটা ইন্টারে ভিড় কম দেখে উঠে পড়লাম। দুটি মাত্র ভদ্রলোক, এক-কোণে র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটি স্ত্রীলোক, খুব সম্ভব এদের একজনের স্ত্রী, জিনিসপত্রের একান্ত অভাব। খুশি হয়ে একটা বেঞ্চিতে কম্বলের ওপর চাদর বিছিয়ে বিছানা করলাম। বালিশ ঠেসান দিয়ে আরাম করে বসে, পা দুটো কম্বল দিয়ে ঢেকে একটা ইংরেজি মাসিকপত্র বার করে ওপেনহেমের ডিটেকটিভ গল্পে মনঃসংযোগ করলাম।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়ল এবং পরের স্টেশনে থামল। আবার চলল। এটা ঢাকা মেল বটে, কিন্তু পোড়াদ পর্যন্ত প্রত্যেক স্টেশনে থেমে থেমে প্যাসেঞ্জার হিসাবেই চলে। পোড়াদ-র পর ছোটোখাটো স্টেশনগুলি বাদ দেয় এবং গতিও কিছু বাড়ায়।

গোয়ালদের পর গোটা তিনেক স্টেশন পার হয়ে একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে ভদ্রলোক দুটি জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। স্ত্রীলোকটি কিন্তু তেমনিভাবে বসে রইলেন।

ব্যাপার কী? একে ফেলেই দেখছি সব নেমে গেলেন। এমন অন্যমনস্কও তো কখনও দেখিনি! ছোটোখাটো জিনিসই মানুষের ভুল হয়, একটা আস্ত মানুষ, তাও আবার একজনের অর্ধাঙ্গ, তাকে আবার কেউ ভুল করে ফেলে যায় নাকি?

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পিছনে দৃকপাত-মাত্র না করে তাঁরা স্টেশনের গেট পার হচ্ছেন। হয়তো ভেবেছেন, চিরদিনের মতো আজও স্ত্রীটি তার পিছু পিছু চলেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলাম ও মশায়—মশায় শুনছেন?

গেটের ওপারে ভদ্রলোক দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাঁশি বাজিয়ে গাড়িও ছাড়ল।

অগত্যা নিজের জায়গায় বসে পড়ে ভাবলাম, তবে কি ইনি একাই চলেছেন নাকি? বাঙালির মেয়ে নিশ্চয়ই, র‍্যাপার দিয়ে নিজেকে ঢাকবার কায়দা দেখেই সেটা বোঝা যায়। বাঙালির মেয়ে, এই রাত্রিবেলা নিঃসঙ্গ যাচ্ছে, তাও আবার পুরুষদের গাড়িতে!

একটু ভেবে বললাম, দেখুন, শুনছেন?

সাড়া নেই।

বললাম, আপনার সঙ্গীরা সব নেমে গেছে, শুনছেন?

এইবার আলোয়ানের পোঁটলা নড়ল, এবং আলোয়ান ও ঘোমটা সরে গিয়ে যে মুখখানা বার হল দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

কিছু নেই, সে মুখের কিছুই এতে নেই। আমার অতসী মামির মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেক তফাত। কিন্তু তবু আমার মনে হল, এ আমার অতসী মামিই!

মৃদু হেসে বললে, গলা শুনেই মনে হয়েছিল এ আমার ভাগনের গলা। কিন্তু অতটা আশা করতে পারিনি। মুখ বার কবতে ভয় হচ্ছিল, পাছে আশা ভেঙে যায়।

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, অতসী মামি!

মামি বললে, খুব বদলে গেছি, না?

মামির সিথিতে সিঁদুর নেই, কাপড়ে পাড়ের চিহ্নও খুঁজে পেলাম না।

চার বছর আগে ঢাকা-মেল কলিশনে মৃতদের তালিকায় একটা অতি পরিচিত নামের কথা মনে। পড়ল। যতীন মামা তবে সত্যিই নেই।

আস্তে আস্তে বললাম, খবরের কাগজে মামার নাম দেখেছিলাম মামি, বিশ্বাস হয়নি সে আমার যতীন মামা। একটা চিঠি লিখেছিলাম, পাওনি?

মামি বললে, না। তারপরেই আমি ওখান থেকে দু-তিন মাসের জন্য চলে যাই।

বললাম, কোথায়?

আমার এক দিদির কাছে। দূর সম্পর্কের অবশ্য।

আমায় কেন একটা খবর দিলে না মামি?

মামি চুপ করে রইল।

ভাগনের কথা বুঝি মনে ছিল না?

মামি বললে, তা নয়, কিন্তু খবর দিয়ে আর কী হত। যা হবাব তা তো হয়েই গেল। বাঁশিকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না। তোমার মেজোমামার কাছে তোমার কথাও সব শুনলাম, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমায় আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না। জানি তো, একটা খবর দিলেই তুমি ছুটে আসবে!

চুপ করে রইলাম। বলবার কী আছে। কী নিয়েই বা অভিমান করব? খবরেব কাগজে যতীন মামার নাম পড়ে একটা চিঠি লিখেই তো আমার কর্তব্য শেষ করেছিলাম।

মামি বললে, কী করছ এখন ভাগনে?

চাকরি। এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মামি বললে, একটু পরেই বুঝবে। ছেলেপিলে কটি?

আশ্চর্য! জগতে এত প্রশ্ন থাকতে এই প্রশ্নটাই সকলের আগে মামির মনে জেগে উঠল!

বললাম, একটি ছেলে।

ভারী ইচ্ছে করছে আমার ভাগনের খোকাকে দেখে আসতে। দেখাবে একবার? কার মতো হয়েছে? তোমার মতো, না তার মার মতো? কত বড়ো হয়েছে?

বললাম, তিন বছর চলছে। চলো না আমাদের বাড়ি মামি, বাকি প্রশ্নগুলির জবাব নিজের চোখেই দেখে আসবে?

মামি হেসে বললে, গিয়ে যদি আর না নড়ি?

বললাম, তেমন ভাগ্য কি হবে! কিন্তু সত্যি কোথায় চলেছ মামি? এখন থাক কোথায়?

মামি বললে, থাকি দেশেই। কোথায় যাচ্ছি, একটু পরে বুঝবে। ভালো কথা, সেই বাঁশিটা কী হল ভাগনে?

এইখানে আছে। এইখানে? এই গাড়িতে?

বললাম, হুঁ। আমার ছোটো বোন বীণাকে আনতে গিয়েছিলাম, সে লিখেছিল বাঁশিটা নিয়ে যেতে। সবাই নাকি শুনতে চেয়েছিল।

মামি বললে, তুমি বাজাতে জান নাকি? বার করো না বাঁশিটা?—

ওপর থেকে বাঁশির কেসটা পাড়লাম। বাঁশিটা বার করতেই মামি ব্যগ্র হাতে টেনে নিয়ে এক দৃষ্টিতে সেটার দিকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বিয়ের পর এটাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম, মাঝখানে এর চেয়ে বড়ো শত্রু আমার ছিল না, আজ আবার এটাকে বন্ধু মনে হচ্ছে। শেষ তিনটা বছর বাঁশিটার জন্য ছটফট করে কাটিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে বাঁশি বাজানো ছাড়তে না বললেই হয়তো ভালো হত।

বাঁশির ভেতর দিয়ে মরণকে বরণ করলে তবু শান্তিতে যেতে পারতেন। শেষ কটা বছর এত মনঃকষ্ট ভোগ করতে হত না।

বাঁশির অংশগুলি লাগিয়ে মামি মুখে তুলল। পরক্ষণে ট্রেনের ঝমঝমানি ছাপিয়ে চমৎকার বাঁশি বেজে উঠল। পাকা গুণীর হাতের স্পর্শ পেয়ে বাঁশি যেন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব বেদনাময় সুরের জাল বুনে চলল।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো অল্প সাধনার কাজ নয়। যার তার হাতে বাঁশি তো এমন অপূর্ব কান্না কাঁদে না। মামির চক্ষু ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে গেল। তার দিকে চেয়ে ভবানীপুরেব একটা অতি ক্ষুদ্র বাড়ির প্রদীপের স্বল্পালোকে বারান্দার দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক সুর-সাধকের মূর্তি আমার মনে জেগে উঠল।

মাঝে সাতটা বছর কেটে গেছে। যতীন মামার যে অপূর্ব বাঁশির সুর একদিন শুনেছিলাম, সে সুর মনের তলে কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ অতসী মামির বাঁশি শুনে মনে হতে লাগল সেই হারিয়ে যাওয়া সুরগুলি যেন ফিরে এসে আমার প্রাণে মৃদুগুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে।

এক সময়ে বাঁশি থেমে গেল। মামির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল। আমারও!

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, এ কথাটাও তো গোপন রেখেছিলে!

মামি বললে, বিয়ের পর শিখিয়েছিলেন। বাঁশি শিখবার কী আগ্রহই তখন আমার ছিল। তারপর যেদিন বুঝলাম বাঁশি আমার শত্রু সেইদিন থেকে আর ছুঁইনি। আজ কতকাল পরে বাজালাম। মনে হয়েছিল, বুঝি ভুলে গেছি!

ট্রেন এসে একটা স্টেশনে দাঁড়াল। মামি জানালা দিয়ে মুখ বার করে আলোর গায়ে লেখা স্টেশনের নামটা পড়ে ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বললে, পরের স্টেশনে আমি নেমে যাব ভাগনে।

পরের স্টেশনে! কেন?

মামি বললে, আজ কত তারিখ, জান?

বললাম, সতেরোই অঘ্রান।

মামি বললে, চার বছর আগে আজকের দিনে—বুঝতে পারছ না তুমি?

মুহূর্তে সব দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। ঠিক! চার বছর আগে এই সতেরোই অঘ্রান ঢাকা মেলে কলিশন হয়েছিল। সেদিনও এমনি সময়ে এই ঢাকা মেলটির মতো সেই গাড়িটা শত শত নিশ্চিন্ত আরোহীকে পলে পলে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

বলে উঠলাম, মামি!

মামি স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, সামনের স্টেশনের অল্প ওদিকে লাইনের ধারে কঠিন মাটির ওপর তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ওই তীর্থদর্শন করতে যাই। আমার কাছে আর কোনো তীর্থের এতটুকু মূল্য নেই।

হঠাৎ জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামি বলে উঠল, ওই ওই ওইখানে! দেখতে পাচ্ছ না? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একটু স্নেহশীতল স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন। একটু জল, একটু জলের জন্যেই হয় তো!—উঃ মাগো, আমি তখন কোথায়!

দু-হাতে মুখ ঢেকে মামি ভেতরে এসে বসে পড়ল।

ধীরে ধীরে গাড়িখানা স্টেশনের ভেতর ঢুকল।

বিছানাটা গুটিয়ে নিযে আমি বললাম, চলো মামি, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মামি বললে, না।

বললাম, এই রাত্রে তোমাকে একলা যেতে দিতে পারব না মামি।

মামির চোখ জ্বলে উঠল, ছিঃ! তোমার তো বুদ্ধির অভাব নেই ভাগনে। আমি কি সঙ্গী নিয়ে সেখানে যেতে পারি? সেই নির্জন মাঠে সমস্ত রাত আমি তার সঙ্গ অনুভব করি, সেখানে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়! ওইখানের বাতাসে যে তার শেষ নিশ্বাস রয়েছে! অবুঝ হয়ো না–

গাড়ি দাঁড়াল।

বাঁশিটা তুলে নিয়ে মামি বললে, এটা নিয়ে গেলাম ভাগনে! এটার ওপর তোমার চেয়ে আমার দাবি বেশি।

দরজা খুলে অতসী মামি নেমে গেলেন। আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। আবার বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। খোলা দরজাটা একটা করুণ শব্দ করে আছড়ে বন্ধ হয়ে গেল।